সমাজতত্ত্ব-র দর্পণে রাজনৈতিক দুর্বত্তায়ন

অধ্যাপক মৃণালকান্তি ঘোষ দস্তিদার

কোন দেশের রাজনীতি বিশ্লেষণ করতে হলে সেই দেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে তা করা যুক্তিযুক্ত। কোন বিষয় বা সমস্যা 'সামাজিক সংগঠন' (social organization) বা 'সামাজিক শৃঙ্খলের' (social order) বাইরের কোন বস্তু নয়। সামাজিক সংগঠন বলতে বোঝায় মানব-সমাজের সবরকমের ত্রিয়াকলাপ এবং সমাজ কাঠামো (social structure) নিয়ে গঠিত একটি সমগ্র। অতএব, সমস্ত মানুষ, প্রচলিত ধ্যান-ধারণা, আশা আকাঙ্খা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, কৃৎকৌশল, ঐতিহ্য, ফ্যাসান, লোকগাথা, লোকরীতি এবং প্রতিষ্ঠান সমূহ --- এই সব কিছু সামাজিক শৃঙ্খলের মধ্যে ওতে াপ্রোতভাবে জড়িয়ে সামাজিক সংগঠনের অবয়ব গড়ে তোলা। সমাজবিজ্ঞানে 'সামাজিক সংগঠন' একটি ব্যাপক পদ (term), যার মধ্যে সব রকম মানবিক ব্যক্তিত্ব, মানুষের সংস্কৃতি এবং সব ধরণের মানবিক সম্পর্ক অন্তর্ভুক্ত আছে। কিন্তু যখন আমরা 'সামাজিক কাঠামোর' কথা বলি তখন কেবলমাত্র মানুষে মানুষে পারস্পরিক সম্পর্ককে বুঝি। অধ্যাপক শিনয় ছড্রপ্তস্ত ট্রড়ন্দ্বপ্সস্তা মনে করেন, সামাজিক সংগঠন ও সামাজিক কাঠামোর ধারণা পরস্পর বিনিময়যোগ্য হতে প ারে। একটি বলতে আরেকটিকে বোঝানো হতে পারে।

দুর্বত্ত (criminal) দুর্বত্তায়ণ ছcriminalization সামাজিক সংগঠনের জমির ফসল। এটিও মূলতঃ সামাজিক সমস্যা। 'সামাজিক বিশৃঙ্খলা' (social disrganization) থেকে 'সামাজিক সমস্যা' (social problems) জন্মলাভ করে সামা জিক সমস্যা বিপুলভাবে দেখা দিলে সামাজিক বিশৃঙ্খলা ঘটে। কারণ সামাজিক সংগঠনের স্বাভাবিক ত্রিয়াকলাপ ব্যাহত হয়। সমাজ স্বাভাবিক নিয়মে চলতে গিয়ে হোচট্ খায়, আর সামাজিক অগ্রগমন বাধা পায়। সামাজিক সংগঠনের বিভিন্ন অংশের মধ্যে (ধ্যান ধারণা, মতাদর্শ, প্রথা, বিধি-নিয়ম, মানবিক সম্পর্ক, ইত্যাদি। অসংহতির কারণে সামাজিক বিশৃঙ্খলা অবশ্যম্ভাবীরূপে দেখা দেয়। কোন ব্যক্তি বা 'ব্যক্তিবর্গ' (group of individuals) সমাজের প্রচলিত আদর্শমান লঙঘন করে চললে সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয়। এ ধরণের 'ব্যক্তিগত অসংহতি' (individual disorganization), সামাজিক সমস্যা এবং সামাজিক অসংহতির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। ব্যক্তিগতভাবে বেকারত্ব যেমন একটা ব্যক্তিগত সমস্যা, ঠিক তেমনিভাবে এটা একটা সামাজিক সমস্যা।'

সামাজিক অসংহতি হল একটি আপেক্ষিক প্রপঞ্চ এবং সামাজিক ব্যবস্থার দুটি আঙ্গিক হল সামাজিক সংগঠন এবং সামা জিক অসংহতি। এলিয়ট ও মেরিল মনে করেন, সামাজিক শক্তি সমূহের মধ্যে ভারসাম্য বিঘ্নিত হলে এবং সামাজিক কাঠ ামোর অবক্ষয় দেখা দিলে পুরানো অভ্যাস এবং প্রচলিত সামাজিক নিয়ন্ত্রণ কার্যকরী থাকতে পারে না। চলমান সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে খাপ-খাইয়ে চলতে হয়। পরিবর্তনের প্রবাহ প্রবাল হলে সামা জিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা তাল মিলিয়ে চলতে পারে না। ফলে দেখা যায় নানান সমস্যা।

সামাজিক ব্যবস্থার অর্থানৈতিক বুনিয়াদ সামগ্রিক পরিবর্তনে বিশেষ ভূমিকা গ্রহন করে। ব্যক্তিগত অসংহতি সামাজিক অসংহতিতে প্রকটিত (articulated) হয়। জৈবিক, পরিবেশগত, অথবা নিরাপত্তাহীনতার মনস্তত্ত্ব বা আর্থিক সংকট থেকে ব্যক্তিগত অসংহতি ঘটতে পারে এবং ব্যক্তিকে দুর্বত্তায়নের পথে ঠেলে দিতে পারে। আবার সমাজ ও রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির মধ্যে যদি ব্যক্তিগত অসংহতি দেখা দেয় এবং তা নিরসনের প্রচেষ্টা উদ্যোগ না করা হয়, তবে তা ব্যাপকভাবে সামা জিক অসংহতি ঘটিয়ে দূর্বত্ত উৎপাদনের উর্বর ক্ষেত্র সহজেই প্রস্তুত করতে সক্ষম।

দূর্বত্ত বা অপরাধী বিভিন্ন ভাবে সমাজ-রাষ্ট্রের প্রচলিত আদর্শমান ও বিধি ভঙ্গকারী। সমাজতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অ

াইন-শাস্ত্র ইত্যাদি বিভিন্নভাবে অপরাধ ও অপরাধীর শ্রেণীকরণ করছে। সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞার্থ নিপণ করার কাজটা দুর হই রয়ে গেছে।

প্রাচীন কালের লোকেদের মধ্যে দানবতাত্ত্বিক (demonological) ধারণা প্রচলিত ছিল। প্রাক্-রাষ্ট্রীয় সমাজে অপরাধ মূলক ক্রিয়াকলাপকে গোষ্ঠী স্বার্থ বিঘ্নকারীরূপে গণ্য করা হতো। তখন দেবতার বিদ্ধে মান-হানিকর মন্তব্য করাকেও অপর াধ বলে সাব্যস্ত করা হতো। সমগ্র গোষ্ঠী বা লোক সমাজের স্বার্থ ও সমৃদ্ধি যাতে আর না ব্যাহত হয়, সেই জন্য অপর াধীকে শাস্তি প্রদান করে দেবতাকে, যিনি সমাজের পরিত্রাতা ও সমৃদ্ধি দাতা, সন্তুষ্ট করার চেষ্টা হতো। তখন মানুষ মনে-প্র াণে বিশ্বাস করতো যে, কোন অপদেহ বা দানবীর আত্মা মনুষ্য-দেহ আশ্রয় করলে মানুষ ঐ রকম আচরণ করে। তাই তারা অপরাধীর দেহকে কুপ্রভাব মুক্ত করার চেষ্টা করতো অথবা তাকে নির্বাসন, এমন কি মৃত্যুদন্ড পর্যন্ত দিতো। অপরাধীতে সংশোধন করার চেয়েও দেবতাকে তুষ্ট করার ব্যাপারটাই ছিল মুখ্য।

অপরাধ সম্বন্ধে আইনানুগ (legal) ধারণা একটু স্বতন্ত্র। মাইকেল ও অ্যাচলার মনে করেন, অপরাধ সংহিতা (criminal code) লঙঘনকারী যে কোন আচরণই অপরাধ। আবার সমাডবিজ্ঞানের মূল ধারণা বলো, প্রচলিত সামাজিক অ াচরণবিধি ভঙ্গ করলেই তা অপরাধ পদবাচ্য। সেই আচরণবিধি বা আদর্শমান (norms) সংবিধান বা সনদে স্বীকৃত হোক না হোক, তাতে কিছু যায় আসে না। বর্তমানে অপরাধ সম্বন্ধে গ্রহমযোগ্য আধুনিক ধারণা, সমাজবিজ্ঞান মনস্তত্ব ও আইন শাস্ত্র সম্মত ধারণার মিশ্রণ ঘটিয়েছে। যে সব ক্রিয়াকলাপ সংঘটন করা বা না করার জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা আছে, সেই সব ক্রিয়া করা বা না করাকেই অপরাধরূপে গ্রাহ্য করা চলে। মনরোগ বিশারদ উইলিয়াম হেলি (William Healy) থেকে শু করে আজকের সমাজবিজ্ঞানীরা অপরাধ সংগঠন ও অপরাধী সৃষ্টির ক্ষেত্রে একাধিক উপাদ ানকেই দায়ী করেন।

আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীদের অভিমত হল, সমসত্ত্বমূলক (homogeneous) বিচ্ছন্ন সমাজে, যেখানে সামাজিক পরিবর্তনের ঢেউ কিছুটা স্তিমিত এবং যে সমাজে অশান্ত পরিবেশের প্রাবল্য নেই, সেখানে অপরাধমূলক ক্রিয়া-কল াপজনিত সমস্যা কখনও প্রকট হতে পারে না। কৃষি-ভিত্তিক গ্রাম সমাজ বা কোন ধর্মীয় সম্প্রদায় ভিত্তিক সমাজে অপরাধ তীব্ররূপে গ্রহন করে না। কিন্তু বহুত্ববাদী সমাজ, যেখানে বিষমত্ত্বমূলক জনাকীর্ণতা ও অভিবাসিত মানুষের আনা-গোনা বেশী -- সেই সব পাঁচমিশালী মানুষ অধ্যুষিত সমাজেই অপরাধ প্রবণতা অনেক বেশী।

বস্তুতপক্ষে সীমিত সম্পদ আর সীমাহীন জনসংখ্যার অসীম চাহিদার মধ্যে ভারসাম্য না থাকায় সংকট ঘনীভূত হচ্ছে। ম ানুষ ,সামুজক বেড়া ডিঙিয়ে চাহিদা পূরণের চেষ্টা করছে। একে অপরের স্বার্থে আঘাত হানছে। এটা হলো দুর্বাত্তায়নের এক পিঠ। অপরদিকে দুর্বত্ত সৃষ্টি ও দুর্বাত্তায়নে শিক্ষার ভূমিকাকে খাটো করে দেখা চলে না। বিবেকানন্দ মন্তব্য করেছিলেন, শিক্ষার বীজ সমাজে ব্যাপকভাবে উপ্ত হলে, আজই হোক আর কালই হোক সমাজের সুস্থিতি ও সমৃদ্ধি ঘটবেই। শিক্ষা সোনার ফসল ফলায়। শিক্ষার মাধ্যমেই ব্যক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব।

শিক্ষার মাধ্যমে যেমন একটি জাতিকে, স্বাদেশিকতায় উদ্বুদ্ধ করা যায়, তেমনি শিক্ষার মাধ্যমেই শ্রেণীচেতনা, সমগ্রতাবাদ এবং সংকীর্ণতাকেও প্রকটিত করা সম্ভব। সবটাই নির্ভর করছে শিক্ষা নীতি নির্ধারণের উপর। শিক্ষার রাজনীতিকরণের সর্বাপেক্ষা বড় বিপদ হল, এর দণ সমাজের প্রভাবশালী সংখ্যালঘিষ্টের প্রাধান্য অটুট রাখার উদ্যোগ গৃহীত হয়। সাতের দশকে (বিংশ শতাব্দীর) প্রথমার্ধ পর্যন্ত বিদ্যালয় পাঠত্রমে নৈতিক ও চারিত্রিক শিক্ষার উপাদানের বিশেষ ভূমিকা ছিল। পরবর্তীকালে বাস্তববাদী (বস্তুবাদী) শিক্ষার নামে পাঠত্রমের আমূল পরিবর্তন ঘটানো হল। ধীরে ধীরে ভারতীয় ঐতিহ্যের শিকড় আল্গা হয়ে গেল। বিশ্বায়ন ও ভোগবাদের (consumerism) পাশ্চাত্য ঢেউ-এর সঙ্গে তথাকথিত বাস্তববাদী প াঠত্রম যেন একটা অনুকুল যোগসূত্র (যাকে (consistency বলা চলে) পেয়ে গেল। ষাটের দশকের শিশু-কিশোরের চা হিদার সঙ্গে বর্তমানের তুল্য প্রজন্মের চাহিদার মধ্যে গগনচুম্বি পার্থক্য যে দেখা দিয়েছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

পাশ্চাত্যের ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদী ভোগবাদ আজকের প্রজন্মের মধ্যে সুপষ্ট। তাই সে দেশের মতই অগ্রগামী ছাত্ররা এ দেশেও গাড়ী চুরি, ছিনতাই, রাহাজানি ইত্যাদিতে জড়িয়ে পড়ছে। নামীদামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মেধাবী ছাত্রছাত্রীরাও পাশ্চাত্যের মতই নানা প্রকার মাদকদ্রব্যে আসক্ত হয়ে হচ্ছে। এরা বিপুল অর্থের চাহিদা মেটাতে মাফিয়া চত্রের সঙ্গে গাটবন্ধন করছে এবং সম্পদ লুন্ঠনের মোক্ষম হাতিয়ার রাষ্ট্রক্ষমতার কাছাকাছি পৌঁছতে সচেষ্ট হচ্ছে। রাজনৈতিক ক্ষমতার হাতিয়ার মা

ফিয়া-নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় ক্ষমতার কাছাকাছি পৌঁছানোটা মোটেই শক্ত নয়। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রবাদী শিক্ষার প্রভাবে যৌথ-পরিবার ভাঙ্গন ধরেছে।১ ফলে দাদু, ঠাকুমা, জেটিমা, কাকা-কাকিমার স্নেহ থেকে শিশু-কিশোররা বঞ্চিত হচ্ছে। অথচ পরিপূর্ণ মানুষ গড়ার কাজে এই স্নেহ ভালবাসার বিরাট ভূমিকা রয়েছে। বিচ্ছিন্নভাবে বেড়ে ওঠা সন্তান-সন্ততি যূথবদ্ধতার সামাজিক বিধির প্রতি আর বিশ্বস্ত হতে পারে না। ফলে অন্ধকার জগতের হাতছানির আর্কষণ এরা এড়াতে পারে না। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দূর্বৃত্তায়নের ব্যাখ্যা প্রদান করা যেতে পারে। নিখিল বিশ্ব সম্পদ প্রয়োজনঅনুপাতে অপ্রতুল। পৃথিবীর তিন-চতুর্থাংশ জলবেষ্টিত; অথচ মোট জলরাশির শতকরা তিনভাগ মাত্র মানুষের কাছে ব্যবহারযোগ্য। সমগ্র ভূ-গোলকটাই বায়ুর আস্তরণে মোড়া, তবুও প্রাণ ধারণযোগ্য বিশুদ্ধ বায়ুর অভাব দেখা দেয়। খাদ্য-পানীয় আদি যাবতীয় ভোগ্যপণ্যের অভাবহেতু কোন না কোন মূল্যের বিনিময়ে এগুলি সংগ্রহ করতে হয়। অপ্রতুলতার জন্যই দেখা দেয় সংকট এবং সংকট নিরসনের বিচিত্র পন্থা পদ্ধতি নিয়ে মানুষে মানুষে দ্বন্ধ ও প্রতিযোগিতা অথবা কার্যক্ষেত্রে সহযোগিতার উদ্ভব হয়।

প্রাক্-সভ্য যুগে যখন প্রকৃতির অকৃপণ দান মানুষকে সংকটের মুখোমুখি করে নি, তখন দেখা দিয়েছিল এক সাম্যবাদী ব্যবস্থা। কারণ তখন পর্যন্ত মানুষ অসময়ে বিপদে পড়ার আশঙ্কায় সঞ্চয়ের তাগিদ অনুভব করে নি। দেখা দেয় নি ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা। বনের ফলমুল, পশুপাখি শিকার করে যা আহরণ করতো তা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়ে চাহিদা মেটাতো।

কালক্রমে যাযাবর শিকারী জীবনের পর্যায়ের অবসানে কৃষিকার্য শু হলো। প্রয়োজন দেখা দিল স্থায়ী আশ্রয় স্থলের। তাই মানুষ ঘর বাঁধতে শু পেয়ে ভোগ্য পণ্যের সংকট (crisis) সৃষ্টি করলো। মানব সমাজের বিবর্তনের ইতিহাসে সম্পত্তি সৃষ্টি হবার পরই আদিম সাম্যবাদী জীবনের সোনার খাঁচায় দিনগুলি আর রইল না। প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রতিযোগিতা ও হিংসার হাত ধরে শোষণের নানান কৌশলও এক শ্রেণীর মানুষ ভালোভাবেই রপ্ত করতে শু করেছিল।

দাস সমাজ থেকে বুর্জোয়া সমাজে রূপান্তরের মধ্যে শোষণ-এর দোসর ছিল নির্যাতন নিষ্পেষণ। অদ্যাবধি সব সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় সংখ্যালঘু শাসক শ্রেণীর হাতেই রাষ্ট্র ক্ষমতা রয়ে গেছে। ক্ষমতাই সম্পদ প্রাচুর্য্য আনে। গণতন্ত্র-প্রজাতন্ত্র শিশু পাঠ্য কাহিনীতে মুখ ঢেকে থাকে জমানার রূপ রঙ বদলায়। বদলায় না শোষণের থাবা। শুধু শোষনের হাতিয়ার রাষ্ট্রযন্ত্রের হাত বদল হয়। যেন তেন প্রকারণে ক্ষমতায় টিকে থাকা আসল কথা। সম্পদশালী শ্রেণী সমাজের সম্পদহীনতকে এবং ধনশালী দেশ দুর্বল দেশকে নানান্ কৌশলে শোষন করে চলেছে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির পালাবদলে যে শোষনের ও নিষ্পেষণের চরিত্র বদল হয় না, তা আজ জলের মতই স্বচ্ছ। ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে ফোর্ড ফাউন্ডেশনের অর্তানুকুল্যে সমাজ বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার দরিদ্র দেশগুলিতে সমীক্ষা চালানো হয়েছিল। এবং এটি ছিল বিকাশশীলতার সমাজবিজ্ঞানের কাছে একটা চ্যালেঞ্জস্বরূপ।

গবেষকরা সমীক্ষা চালিয়ে দেখতে পেলেন যে, আধুনিকীকরণের (modernization) নামে ক্ষমতাবান শাসকশ্রেণী দেশের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ নিজেদের কুক্ষিগত এবং অধিকামশ মানুষকেই দারিদ্র সীমার ওপরে টেনে তোলা যায়নি। আধুনিকীকরণ ও বিকাশশীলতার রাজনীতি সমাজে নতুন নতুন স্বার্থগোষ্ঠী গড়ে তুললো। জ্ঞাতি-কুটুম্বের (kinship) সামাজিক সম্পর্ক যখন জীবন ধারনের প্রয়োজনীয় রসদ যোগান দিতে এবং দৈহিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার অঙ্গীকার প্রদান করত অক্ষম, তখন জ্ঞাতি-সম্পর্কের আওতার বাইরে পোষ্যবর্গতা (Clientelism) গুত্বপূর্ণ সম্পর্করূপে কার্যকরী হয়।

সাম্প্রতিক কালে তৃতীয় বিশ্বের রাজনৈতিক পরিবর্তন সমীক্ষা করার সময় 'পৃষ্ঠপোশক-পোষ্যবর্গের' সম্পর্কের ক্ষেত্রে এখ নতুন প্রবণতা দেখা গেছে। জাতীয় ও স্থানীয় স্তরের রাজনীতিকরাও, বিশেষত ক্ষমতা দখলের পদক্ষেপ হিসাবে, তাদের রাজনৈতিক ভিত পোক্ত করার জন্য নিজেদেরকে গ্রামীন পৃষ্ঠপোষকের ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করতে উদ্যোগী হয়েছে। পোষ্যবর্গতার রাজনীতি ভারতেও যথেষ্ট প্রসার লাভ করেছে। অবশ্য বর্তমানে আধুনিকতার স্পর্শে --- বিশেষতঃ শিক্ষা-বিস্তার, শিল্পায়ন, নগরায়ণ ও গণরাজনীতির আবির্ভাবে 'পৃষ্ঠপোষক-পোষ্যবর্গ' সম্পর্কের অবনমন ঘটেছে। আধুনিক সংগঠনসমূহ, যেমন শ্রমিক-সংঘ, পেশা-ভিত্তিক সংগঠন, জাত-পাতসংগঠন ইত্যাদির মাধ্যমেই শাসক শ্রেণীর স্বার্থ প্রকটন ক্রিয়াকলাপ চলে। রাষ্ট্রক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য অথবা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল পুনর্দখল করার জন্য রাজনৈতিক গে

াষ্ঠীগুলি বিংশ শতাব্দীর ছয়ের দশক থেকেই অন্ধকার জগতের বিভিন্ন গ্যাং ও মাফিয়া গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করতে থাকে।

বিকাশশীলতার নামে উন্নয়ন যজ্ঞে আমদানিকৃত বিপুল অর্থসম্ভার আত্মসাৎ করার একটি মোক্ষম হাতিয়ার হল রাষ্ট্র ক্ষমতা। এমনই এক বিকাশশীলতার আর্থ-সামাজিক বাতাবরণে রাজনীতির বল্গা আজ আর দল বা নেতার হাতে রইল ন া। বিপুল অর্থ আর পেশী শক্তির প্রয়োজন দেখা দিল নির্বাচন বৈতরণী পার হবার জন্য। বিপুল অর্ত আর পেশী শক্তির অ াস্ফালনে রাজনীতির রঙ্গমঞ্চ থেকে সুস্থ ও স্বচ্ছ রাজনীতি সাতের দশকের পর থেকে বিদায় নিতে শু করল।

শিল্পায়ত রাষ্ট্রকাঠামোতে অধিকাংশ মানুষের কাছেই ব্যক্তিগত রাজনৈতিক সম্পর্কের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে গেছে। প্র াচুর্য্য সম্ভার ও প্রতুল সুযোগের দ্বার উন্মুখ হয়ে সম্পর্কের জালে নতুন সূত্র বয়ন হয়েছে। রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় ভাবাদর্শ যতই প্রলেপ মাখাক, লেনা-দেনা বিকিকিনির বাজার হলো রাজনীতি। রাজনৈতিক দলগুলির স্যুম্পীটার বর্ণিত ব্যবসা য়িক প্রতিষ্ঠান ছাড়া কিছউই নয়। রাজনৈতিক সমর্থন ক্রয় করে ক্ষমতার সলনদ দখল করার জন্য চাকরি-বাকরি, ল াইসেন্স পারমটি বিতরণ করাও যখন আর যথেষ্ট বলে প্রতিভাত হল না, তখন থেকেই পেশীশক্তির সাহায্য নেওয়া জরী হয়ে পড়ল। তাই অন্ধকার জগতের সঙ্গে রাজনীতিকদের মেলবন্ধন স্থাপিত হল। ক্রমবর্দ্ধমান জন-বিস্ফোরণ, মুষ্টিমেয় হাতে জাতীয় সম্পদ কেন্দ্রীকরণ, বল্গাহীন বেকারত্ব ও অর্থনৈতিক মন্দার বাতাবরণে অবস্থাটা আজ এমন পর্যায়ে এসেছে যে--অ াজ আমরা এক মারাত্মক প্রশেনর সম্মুক্ষীণ --আজ রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রকৃত নিয়ন্ত্রক কারা? তথাকথিত রাজনৈতিক নেতারা, নাকি অন্ধকার জগতের সম্রাট দুর্বত্তরা!

মিশেল মস্কাদের 'শাসক-শ্রেণী তত্ত্ব' বোধহয় শাসক-শ্রেণীর রূপেরে সঙ্গে বড় বেমানান। দুর্বত্তায়ণ গণতান্ত্রিক নির্বাচন তথ া গণতান্ত্রিক শাসনকে (আইনের শাসনকে) প্রহসনে পরিণত করেছে। ডঃ সন্তোষ ভট্টাচার্য্য যথার্থই বলেছেন, ভারতবর্ষের 'অনেক রাজ্যের মত পশ্চিমবঙ্গেও আইনের শাসন গত কয়েক দশক ধরে ভোঁতা .....। তফাৎ দুটি ব্যাপারে। প্রথম, র াজনৈতিক খুনোখুনি। অন্যান্য রাজ্য, ব্যক্তিগত আক্রোশ বাদ দিলে, খুনোখুনি প্রধানত রাজনৈতিক, যা ষাটের দশক থেকে চলে আসছে। দ্বিতীয় তফাৎ হল, গত দুই দশকের বেশী সময়ে, বামফ্রন্ট সরকারের আমলে পরিকল্পিতভাবে, সমাজকে অ াইনের শাসনের বদলে দলীয় শাসনে আনা, প্রয়োজনে আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে। দুর্বত্তদের দ্বারা সন্ত্রাস সৃষ্টির ম াধ্যমে বুথ দখল, রিগিং, ভোটার তালিকায় কারচুপি, ছাপ্পা-ভোট, জাল-ভোট ইত্যাদির সাহায্য ভোটের ফলাফলে প্রকৃত জনমতের প্রতিফলন কয়েক দশক ধরে লুপ্ত হয়ে গেছে। সুস্থ গণতন্ত্রে নিষ্কলুষ নির্বাচন বজায় থাকলে পৃথিবীর কোন গণতন্ত্রে একটি দল বা গোষ্ঠীর পক্ষে এক নাগাড়ে দশকের পর দশক ধরে ক্ষমতায় টিকে থাকা সম্ভব নয়। কেননা, গণতন্ত্রের স্বাভাবিক ধর্ম হল জমানার পরিবর্তন।

রাজনীতিক দুর্বত্তায়নকে মজবুত করতে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের প্রভাবশালী রাজনৈতিক মাফিয়া গোষ্ঠীগুলির প ারস্পরিক মেলবন্ধও এধরনের বিন্যেসে এক নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে। এখানে প্রাদেশিক বা ভাষাগত বা জাতপাতগত প ার্থক্য কোনরূপ প্রতিবন্ধক হয়ে ওঠেনি। জনগনের সম্পদ আরো মসৃণভাবে লুঠ করার তাগিদে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, মহার াষ্ট্র, তামিলনাড়ু, ও উত্তর প্রদেশের মাফিয়া-রাজনীতিকরা একই মাফিয়া চক্রের অঙ্গীভূত। এরা পারস্পরিক স্বার্থ রক্ষা কর ার ক্ষেত্রে অঙ্গীকারবদ্ধ। বর্তমান বিশ্বায়নের যুগ সমগ্র বিশ্বব্যাপি রাজনীতিক-মাফিয়া চক্রের মেলবন্ধন ঘটতে চলেছে। এক কথায়, জাতীয় রাজনীতি-মাফিয়া চক্র আন্তর্জাতিক চক্রে পর্যবসিত হতে চলেছে। বহুজাতিক সংস্থা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক কার্টেল ইত্যাদির খোলসের আনালে এই আন্তর্জাতিক মাফিয়া মেলবন্ধন ত্বরান্বিত হচ্ছে। তামিলনাড়ুর রাজনীতিক-মা ফিয়ার কুকর্ম নিয়ে যখন হৈ চৈ হয়, থকন বুঝে নিতে হবে যে, এর সঙ্গে অনান্য রাজ্যের রাজনীতিক-মাফিয়ারও যুক্ত। কে াক কয়লা কেলেঙ্কারীর অংশীদাররা তামিলনাড়ুতেই সীমাবদ্ধ নয়, পশ্চিমবঙ্গেও এর লেজুড় অস্তিত্বমান। অনুরূপভাবে বিহারের পশুখাদ্য কেলেঙ্কারী বা পশ্চিমবঙ্গের কোলমাফিয়াদের ক্রিয়াকলাপ, ট্রেজারী কেলেঙ্কারী ইত্যাদির লেজুড় পশ্চি মবঙ্গের সীমানা ছাড়িয়েও বহুদূর পর্যন্ত ব্যপ্ত। আবার ভারতের জনসম্পদ লুণ্ঠনের অংশীদাররা সূদূর ইটালীতেও অস্তিত্বশীল। এ সবের প্রতিক্রিয়া হিসাবে দুনিয়াতে শোষিতদের (মজদুর?) এক হওয়ার মার্ক্সীয় আহ্বানের ডাক কি প্র াসঙ্গিক হয়ে উঠবে?

দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি যদে অগ্রগমনের অমোঘ বিধি হয় তাহলে বৈচিত্র্য থাকাটাই স্বাভাবিক। 'মাফিয়া শোষক মুনাফাবাজদের'

আন্তর্জাতিক চত্রের স্বার্থান্ধতার দণ 'সমাজ সংস্কৃতি-অর্থনীতির' দেশান্তরিক বৈচিত্র্য যদি ধবংস হয়, তা কি নিখিল-ৰিশ্ব-এর সভ্যতার সংকট ঘনিয়ে আনবে না। পুঁজিবাদী পাশ্চাত্য দুনিয়া দরিদ্র দেশগুলিতে আধুনিকীকরণের নামে পাশ্চাত্যকরণের (তথা ভোগবাদ বা স্তুঙ্গস্করুব্দত্তুগ্নন্দ্বজ্ন্ব্দপ্ল-এর) যে রঙ্গমশাল প্রজ্জ্বলিত করেছে, তার রোশনাই মিলিয়ে গেলে অবশিষ্ট থাকবে শুধু অন্ধকার। একবিংশ শতাব্দীর প্রবেশ দ্বারে পৌঁছে ভাবতে হবে ভোগবাদ আমাদের জাতীয় মনস্তত্ত্বের সঙ্গে বেমানান বলে এর পরিণাম আমাদের কোথায় নিয়ে যাবে। ভোগবাদের শ্যেন-দৃষ্টি তৃতীয় ৰিশ্বকে লুণ্ঠন করে চলেছে। অথচ সেই পশ্চিমেও অনুভূত হচ্ছে এর ধবংসাত্মক পরিণাম। তাই তো সেখানে দিশাহারা মানুষ হিপি হচ্ছে অথবা 'হরে কৃষ্ণ হরে রাম' সংকীর্তনের ধুয়ো তুলে ভারতীয় ত্যাগবাদে আকৃষ্ট হচ্ছে। পাশ্চাত্যের ভোগবাদী জীবন পদ্ধতি শুধু যে সামাজিক-সাংসকৃতিক বাতাবরণ নষ্ট করছে, তাই নয়। এর দণ জগতের প্রাকৃতিক পরিবেশের সুস্থতাও নষ্ট করছে। ফলে, মানব সভ্যতা আজ ঐহ্যিক-পারমার্থিক গহ্বরের সম্মুখিন। এ সবের সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিকদুর্বত্তায়ন বিশ্লেষণ করাই বিধেয়।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com